দেবজ্যোতি মিশ্র

পরবর্তী প্রজন্মের বারুদ

যেকোনো art form-এ বিপ্লবের যে ব্যাপারটা থাকে, তাই আসলে departure। একটা ছেদ। এই departure কেমন ভাবে ঘটছে, কোন সময়ে ঘটছে, কার হাত দিয়ে ঘটছে — এটা খুব জরুরি একটা বিষয়। বাংলা সঙ্গীতের ধারায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে যদি বলি একটা পিলার, যার মূলে প্রবাহিত হয়েছে যুগ-যুগান্তের সঞ্চয় — সুরে, সঙ্গীতে। সেই সুর, সঙ্গীত, সংস্কৃতি যখন এসে দাঁড়াল একটা transit point-এ, সেখান থেকে সঙ্গীত আবার এগিয়ে যাবে তার পরবর্তী departure-এ, ছেদ-এ। যাকে বলে জরুরি ছেদ। ঠিক তখনই আবির্ভাব হবে বিস্ময়কর প্রতিভার। ইতিহাস অপেক্ষায় থাকে সেই বিস্ময়কর প্রতিভার জন্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসুরি সলিল চৌধুরী যদি সেই বিরল বিস্ময়কর প্রতিভা হন। তাহলে তাঁর পরবর্তী একেবারে ভিন্নধর্মী বিষয়, সঙ্গীত, সমাজ — সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে উদিত হলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, আবিষ্কার করলেন সত্তর সমকালীন সময়কে। তো সেই সামাজিক পট পরিবর্তনের সাথে শব্দ অর্থাৎ sound অর্থাৎ শব্দের মানবিক, সংবেদনশীল উচ্চারণের একটা খুব জরুরি ভূমিকা আছে। এবং সেই জরুরি ভূমিকায় গৌতম চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দশকে একটা departure ঘটিয়ে দিলেন। এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনেক রকমের কথা বলছি। কিন্তু মূল এই কথাটা কখনো প্রখর প্রবলভাবে জোর গলায় সমস্ত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারছিনা যে এই ছেদটা গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঘটিয়েছেন। এই ভাঙচুর, deconstruction অর্থাৎ বিনির্মাণটা এই মানুষটাই ঘটিয়েছেন। আমরা মহীনের ঘোড়ার কথা বলি। কিন্তু মহীনের ঘোড়া কিছু মানুষকে সম্বলিত করে যদি হয়, তাহলে সেই মহীনের ঘোড়ার মূল মানুষ, প্রাণকেন্দ্র হলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে যে বিস্ফোরণগুলো ঘটছে, যে বৈপ্লবিক ভাবনাগুলো ঘটছে, তাই তাঁর মিউজিকে আসবে। কিন্তু সে মিউজিক আর প্রথাগতভাবে শুধু একজন মিউজিশিয়ানের হবে না। এই পরিচালনাটা, এই পরিকল্পনাটাও কিন্তু তাঁরই। এখন মুশকিল হচ্ছে গৌতম চট্টোপাধ্যায় একজন অত্যন্ত দক্ষ মিউজিশিয়ান। মানে এই দক্ষ মিউজিশিয়ানটা নিজে আমি একজন মিউজিশিয়ান বলেই বলতে পারছি। যদিও গৌতম চট্টোপাধ্যায় সে ব্যাপারে নিজেকে কি মনে করতেন সেটা আমি জানিনা কিন্তু গৌতম চট্টোপাধ্যায় বারবার করে শিখতে বলতেন। ব্যক্তিগতভাবে বহু কথার মধ্যে আমিও মনে

করি শেখাটা জরুরি। এই শেখাটা কিন্তু একজন জিনিয়াসের অন্যরকম ভাবে হবে। সলিল চৌধুরী প্রাথমিকভাবে কোনো প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি গভীর মনোনিবেশে করেছিলেন। এইটা একইরকম ছিল গৌতম চট্টোপাধ্যায়েরও। আর আমরা যদি মূল প্রবাহ দেখি, তাহলে দেখব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। যে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে না গিয়েও একটা ধারা তৈরি করতে পারলেন। যা একেবারে রবীন্দ্রনাথের, যা একেবারে সলিল চৌধুরীর, একেবারে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের। এই কথাটা বলতে গেলে পরে আমার কোনো দ্বিধা হয় না, জড়তা আসেনা, কখনো কোনো শব্দ থতমত খায়না, থমকে দাঁড়ায় না। কারণ আমি এটা বুঝতে পারি, ঠিক যেরকমভাবে আমরা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের একজন কবিকে এবং সঙ্গীতকারকে পাই — রবীন্দ্রনাথকে। যার মধ্যে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত মিলেছে, ঠিক তেমনি ভাবে একটা transit point-এ এসে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন — 'বাঁশি তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে'। এই বাঁশিটি এসে পরে এক সহজাত উত্তরাধিকারির সূত্রে সলিল চৌধুরীর হাতে। আর পরবর্তী সময়ে আমরা আর একজন মানুষকে দেখি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, যিনি সামাজিক পট পরিবর্তনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশিতে মোহিনী সুর বাজালেন, এঁদেরই উত্তরসূরি।

এখন musically দেখা যাক, কী পরিবর্তন এবং কী musical structure — মিলেমিশে রয়েছে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গানে, তাঁর ভাবনা-চিন্তায়, এবং তাঁর presentation-এ। পৃথিবীব্যাপি যে ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে সমানে, যার সামাজিক অভিঘাত মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, পরিবর্তন আনে সামাজিক ব্যবহারে, সেখানে দাঁড়িয়ে মিউজিকের ভূমিকাটা যে খুব বড়ো, এটা সবাই আমরা জানি। এখন মিউজিকের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে আগে, বলা যেতে পারে দ্রুততর অবস্থায় বিশ্বায়ন ঘটে। এই বিশ্বায়ন কিন্তু শুধুমাত্র আর তখন অর্থনৈতিক থাকে না, সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিষয় এসে যায়। একটা শহর কলকাতা, এই কলকাতা শহর জুড়ে Bengal movement থেকে সত্তর দশকের যে রাজনৈতিক উত্তাল কলকাতা — সেইসময় যে পরিবর্তন আমরা দেখি কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে, সেখানে সঙ্গীতের মধ্যে কিন্তু আমরা সেই বিশেষ পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করছি না। অর্থাৎ বিশ্বময় অনেক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন, social changes হয়ে চলেছে, সেগুলো আমরা দেখছি কোথায় গানের মধ্যে? গানের মধ্যে সেই সময়ের ছাপ পড়ছে না। কিন্তু কোনো সময় আসলে আমাদের মনে হলেও থমকে দাঁড়ায় না। আসলে সময় অপেক্ষা করতে থাকে সেই মানুষের জন্য যিনি হাত ধরবেন সময়ের।

আমি যে পাঠকের জন্য লিখছি তাদের যদি কিছু ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকে, তাহলে তাদেরকে বলতে সুবিধে হবে। আমি ধরেই নিচ্ছি, আমার পাঠক এগুলো জানেন বা জেনে নিতে পারবেন। জোয়ান স্টেবাস্টিয়ান বাখের নিজের মিউজিক ছাড়া তাঁর যে ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, তা হল তিনি মিউজিক হারমোনাইজেশানের জনক। মিউজিকের হারমোনাইজেশান তাঁর হাত দিয়ে পরিপূর্ণ আকার নিতে থাকে। বাখের হাত

ধরে তাঁর হারমোনাইজেশানের সত্যিকারের পথটা পেলাম। এর মধ্যিখানে ঘটে গেছে অনেক বড়ো বড়ো বিপ্লব। আমরা পেলাম বাখের সমসাময়িক এন্ড্রুকে। এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে হাইডেন, মোৎজার্ট, বেঠোফেন, সুবার্ট, মেন্ডেলসেন। আমরা পেলাম ড্রাম্‌স্‌কে, আমরা পেলাম সুম্যানকে। আমরা পেয়েছি চ্যয়কগস্কিকে, আমরা পেলাম ওয়ার্গনারকে। কিন্তু তবুও আমরা বলছি ট্র্যাভেনস্কিতে এসে বিপ্লবটা ঘটল। কেন? তার কারণ সামাজিকভাবে পৃথিবী তখন তার সমস্ত ক্লাসিকাল এবং রোমান্টিক সংজ্ঞার বাইরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়েছে এক অন্য সংঘাতের, এক অন্য যুদ্ধের। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত নির্ণয় করে দিচ্ছে যে এই সামাজিক পটপরিবর্তনের রং-রূপ-রেখাটা কেমন হবে। ফলে সঙ্গীতের মধ্যে সময়ের চিহ্ন থাকে সবচেয়ে সুস্পষ্ট। কিংবা বলা যেতে পারে বিভিন্ন art form-এর মধ্যে থাকে সামাজিক পরিবর্তনের চিহ্নগুলি। তাই ট্রাভেনস্কিতে এসে আমরা যে পৃথিবীকে পাচ্ছি, সে পৃথিবী এ তাবৎ কালের পৃথিবীর ইতিহাসের থেকে আলাদা। তাই ট্র্যাভেনস্কির মধ্যে আমরা দেখছি ভাঙচুর। তিনি তাঁর ধ্রুপদী সমস্ত কিছু শিক্ষার পরেও কিন্তু, তাঁর কিছু কিছু জিজ্ঞাসা, প্রশ্নগুলির musical উত্তর পাওয়ার জন্য discorden-এর ব্যবহার করছেন। এই যে discorden, অর্থাৎ নতুন হারমোনির জন্ম হচ্ছে; তা শুধু মিলমিশের নয় — মিশে যাওয়ার নয়, তা সংঘাতের, তা contrast-এর। এই discorden-এর জন্ম দিচ্ছেন ট্রাভেনস্কি। ঠিক তেমন-ই আমরা যদি বাংলা গানের জায়গা থেকে দাড়িয়ে বলি রবীন্দ্রনাথকে মূল কাঠামোয় ধরে। তারপর অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা কাজী নজরুল ইসলাম্‌কে পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি কমল দাশগুপ্তকে, আমরা পাচ্ছি অতুলপ্রসাদকে, আমরা পাচ্ছি রজনীকান্তকে। তার পরবর্তী সময়ে আমরা হিমাংশু দত্তকে পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি রায়চাঁদ বড়াল এবং এক শ্রেষ্ঠ composer পঙ্কজ মল্লিককে। কিন্তু এই সব কিছুর হাত ধরে আমরা যেমন সলিল চৌধুরীতে এলাম, এবং সলিল চৌধুরীর সমকালীন সঙ্গীতকার সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতকারদের পাচ্ছি। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের গুণে গুণান্বিত। কিন্তু সত্তরের দশকে বদলে যাওয়া একটা পৃথিবীকে দেখলাম। যেরকম চল্লিশের দশক বদলে দিয়েছিল আমাদের বাংলার সমস্ত কিছুকে। তাই আমরা সলিল চৌধুরীকে একটা path finder, একটা break point মনে করছি। তেমনি সত্তরের দশকে আবার যখন উত্তাল বাংলা, আবার যখন উত্তাল কলকাতা, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তখন বিটলসের এই বড়োসড়ো ঘটনা ঘটে গেছে, তার রেশ প্রেসিডেন্সি কলেজে কীভাবে আসবে? তার রেশ বাংলার সঙ্গীতসমাজে কীভাবে আসবে? এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা দিয়ে তাঁর সময়কে কীভাবে সঙ্গীতে আঁকবেন। musically আঁকবেন? যেখানে তাঁর পূর্বসুরির কাছে তাঁর ঋণ থাকবার পরেও তাঁকে ভাঙতে হবে, চুরমার করতে হবে তাবৎ কালের সমস্ত কিছু। এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নয়, নিজের নাম তুলে ধরবার জন্য নয়, ইতিহাসের পতাকাকে তুলে ধরবার জন্য, তাঁর চিহ্ন রেখে দেওয়ার জন্য। যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর পরবর্তী সময়ে মানুষ এসে বুঝতে চেষ্টা করবে আসলে ঐতিহাসিক একটা পিলার কী করে তৈরি হয়। বুঝতে চেষ্টা করবে তাঁর ব্যতিক্রমী সত্ত্বাকে। যা হয়ে উঠল তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের বারুদ।